বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২০৩-২১৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

রংপুর বিভাগে উন্নয়ন সম্ভাবনা ও সমস্যা

মোহাম্মদ জাকারিয়া*
সজীব কুমার রায়**

মূল শব্দ *রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব, মানবসম্পদ, সেচের চাহিদা, পিপিপি, ক্ষুদ্র উৎপাদক, লোহার খনি, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বেকারত্ব, দারিদ্র্য হার হ্রাস, বাজেট বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্য*

অবতরণিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতি দৃঢ়তার সাথে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবিলা করে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতীক বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৯-২১ (Medium-Term Macroeconomic Framework —MTMF, 2019-21) প্রণয়ন করা হয়েছে। কাঠামোতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ৭.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮.২ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জিডিপির ৩১.৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপির ৩৩.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিনিয়োগ জিডিপির ৩৫.৩ শতাংশে পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মোট বিনিয়োগের ২৬.৩ শতাংশ আসবে বেসরকারিভাবে। অবশিষ্ট ৯ শতাংশ বিনিয়োগ আসবে সরকারিভাবে। সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ এবং সরকারের গৃহীত চলমান বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের ফলে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। সরকার এক্ষেত্রে বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রসারের লক্ষ্যে বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, বাংলাদেশ; ই-মেইল: jakaria88rueco@gmail.com

** প্রভাষক, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, বাংলাদেশ; ফোন: ০১৭২৩ ২৯৬৫০৯ ই-মেইল: sajibkumarroy@gmail.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক দিনাজপুর আঞ্চলিক সেমিনার-২০১৯-এ পঠিত, ২১ ডিসেম্বর ২০১৯।

কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দ্রুত বিদ্যুতায়নের চেষ্টা বাস্তবায়ন, জ্বালানির বহুমুখীকরণ, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিপিপির আওতায় অবকাঠামো খাতে সরকার যে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে তা বাস্তবায়নের ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮)।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমান অবস্থা থেকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অত্যন্ত সুদৃঢ় অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যত বেশি সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে স্বার্থান্বেষীদের আগমন তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সৃষ্ট সম্পদের নিরাপত্তা বিধান রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্বগুলির অন্যতম। আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও দুর্বল প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সীমা বিস্তৃত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তনের হুমকি অপেক্ষা রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা, নিরাপত্তাহীনতা, আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন পরাশক্তির হস্তক্ষেপ বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৃষ্ট সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অবশ্যই সফলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

সম্ভাবনাসমূহ

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো আলাদা। ক্রমবিকাশমান কৃষি, রপ্তানিতে শিল্প পণ্যেও আধিপত্য, বিশাল সক্ষম মানবসম্পদ ও দীর্ঘমেয়াদে মানবসম্পদের স্থিতিশীল প্রবাহের নিশ্চয়তা, নারী শিক্ষার উচ্চহার ও এর অতিদ্রুত বিকাশ, সামাজিক সূচকে অগ্রগতি, অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের গতিশীল ও সরব উপস্থিতি ইত্যাদি সবই বাংলাদেশের অর্থনীতির বিগত দিনের অর্জন ও অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ শক্তির নিয়ামক। পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা এখনও উজ্জ্বল। আইটি খাতে, ঔষধ শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, উড়োজাহাজ ব্যবস্থাপনা, পরিবহন ও যোগাযোগ, পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনীতি মন্দা অবস্থা থেকে পুনরায় প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরছে, এ অবস্থায় বাংলাদেশের অথনীতির ওপর একটি ধনাত্মক প্রভাব সৃষ্টি হবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে সামনের বছরগুলিতে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

বাংলাদেশ কেবল একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দেশ নয়, একটি বৃহৎ অর্থনীতির দেশও বটে। জিডিপি ও আমদানি রপ্তানির আকার বিবেচনা করলে এ চিত্র ফুটে উঠে। একটি সরকারের সাফল্যের সবচেয়ে বড় নিয়ামক হচ্ছে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সফলতা। বাংলাদেশে প্রতিবছর ২০ লক্ষাধিক শ্রমশক্তি শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এই বিশাল শ্রম শক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিশীলতা আরও ত্বরান্বিত করবার জন্য অর্থনীতিতে এখন বড় আকারের প্রকল্প গ্রহণের সময় এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ, নদী অববাহিকায় কৃষি জমি সম্প্রসারনের জন্য পরিকল্পিতভাবে ভূমি আহরণ, ব্যাপক ও বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিকে মোকবেলা করবার জন্য ভূমির

উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বিভিন্ন প্রকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক বাজারে মানব সম্পদের চাহিদার গতি প্রকৃতি সঠিকভাবে নিরূপনের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের বাজার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার ইত্যাদি। নদী অববাহিকায় যে বিপুল পরিমাণ পলি পরিবাহিত হচ্ছে তা জলপথের নাব্যতা হ্রাস করলেও সঠিক কর্মকৌশল প্রনয়ণের মাধ্যমে তা আমাদের জন্য আর্শীবাদে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তাছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিগন্ত প্রসারিত করবার জন্য এখন ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন অর্থনীতিতে নতুন নতুন পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করে ফলে নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই জায়গায় বাংলাদেশের দিগন্ত অনেক বেশি বিস্তৃত, এবং এই সম্ভাবনাকেও যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধির মধ্যেও বিপুল সম্ভাবনা বিদ্যমান। এরই ধারাবাহিকতায় রংপুর বিভাগের অন্তর্গত নিম্নোক্ত খাতগুলোতে গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে।

পানি (সেচ) ব্যবস্থাপনা

কৃষিনির্ভর এই অঞ্চলের সকল জেলাই খাদ্যে উদ্বৃত্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত। এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান সমস্যা খরা প্রবণতা এবং সেচ ও পানীয় পানির অপ্রতুলতা। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষির বিকাশ সেচের চাহিদাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে যার প্রধান জোগান ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে। এটি কোনো টেকসই প্রক্রিয়া নয়, যা বিশেষজ্ঞ মহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত এবং বিকল্প পন্থা অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এজন্য নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ রোধ করে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচের জন্য পানি সংরক্ষণ ও তা শুকনো মৌসুমে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা বিভিন্ন সময় শোনা যাচ্ছে। এ ধরনের প্রচারণা অবিবেচনা প্রসূত ও সেচ ব্যবস্থাপনার খণ্ডিত চিত্র উপস্থাপন করে। বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো বড় সেচ প্রকল্প সফলতার মুখ দেখেনি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নদীর গতিপথ পরিবর্তন, ব্যাপক ভূমি ক্ষয় ও পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। এ বিষয়ে ব্যাপক তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ গবেষণা রয়েছে। এক্ষেত্রে নদীর গতিরোধ না করে নদীর স্বাভাবিক গতিধারাকে কাজে লাগিয়েই আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি লাভ সর্বাধিক করা সম্ভব। সেই জন্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করে এই খাতকে সম্ভাবনাময় করে গড়ে তোলা যায়।

ক) নদীর নাব্য বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী তীরবর্তী এলাকায় ভূমি উদ্ধার ও তার যথাযথ অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

খ) প্রাকৃতিক জলাধারগুলো পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের মাধ্যমে বর্ষা মৌসুমের পানি সংরক্ষণ ও পানির যথাযথ অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। বৃহত্তর বরেন্দ্র এলাকার মাটির বৈশিষ্ট্য ও ভূমির ঢাল পর্যালোচনা করলে সহজেই ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহার যে একমাত্র বিকল্প তা সহজেই বোঝা যায় এবং এ ব্যাপারে বহু বিশেষজ্ঞ মতামত সুপ্রতিষ্ঠিত।

গ) সেচের ক্ষেত্রে পানির অপচয় হ্রাস করবার জন্য সেচ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ। পানি অমূল্য সম্পদ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানির সর্বোত্তম ও সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য পৃথিবীব্যাপী প্রযুক্তি আবিস্কৃত হয়েছে। পানির অপচয় রোধে প্রযুক্তি নির্ভর সাশ্রয়ী পানি ব্যবহার নিশ্চিত করবার জন্য এক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থনৈতিক অঞ্চল

বিনিয়োগ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল একটি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সরকারি, বেসরকারি, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারী (পিপিপি) ও বিদেশি—এই চার ধরনের অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন নিয়ে কাজ করছে সরকার। এরই অংশ হিসেব ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার যার মাধ্যমে বছরে অতিরিক্ত ৪ হাজার কোটি ডলার রপ্তানি আয়ের সুযোগ তৈরি হবে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশের অর্থনীতি গতি পাবে, তেমনি বেকার সমস্যা থেকেও মুক্ত হবে বাংলাদেশ (দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)। এরই অংশ হিসেবে দিনাজপুর সদর উপজেলার সুন্দরবন গ্রামে মোট ৩০৮ একর জমির উপর একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার ব্যাপারে কাজ শুরু করেছে সরকার, যার মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে, তেমনি এই অঞ্চলেরও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হবে। কৃষিভিত্তিক এলাকার কথা বিবেচনা করেই নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেড এর ন্যায় দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প কলকারখানা, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং, গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়া যেহেতু দিনাজপুরে সম্প্রতি একটি মূল্যবান লোহার খনি পাওয়া গেছে, সেহেতু এই লোহার খনির ওপর ভিত্তি করে এখানে লোহা ও স্টিল কারখানা স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি এই অঞ্চলে বেকারত্বের হার বেশি হওয়ায় বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ও এ দেশের মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তা ছাড়া দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা হলে উত্তরবঙ্গের শিল্পায়ন ঘটবে এবং সহজ শ্রম পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে (বাংলা ট্রিবিউন, জুলাই ৯, ২০১৯)।

কৃষিতে ক্ষুদ্র উৎপাদকের হাত সুসংহতকরণ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই অঞ্চলের কৃষির গুণগত মানের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। চাষের নিবিড়তা এবং রাসায়নিক সার ও অন্যান্য উপকরণের প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিকের মজুরি, উপকরণের দাম ও সেচের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়নি, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষিপণ্যেরও মূল্য হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সময়ে ধানের মূল্য উৎপাদন খরচের চেয়ে নিচে নেমে গেছে ও কৃষক দারুণভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে এটি একটি সাধারণ ধারা। ফলে কৃষকের হাত ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হতে বাধ্য ও দেশের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। এমতাবস্থায়, কৃষককে সরাসরি ভর্তুকির আওতায় এনে উৎপাদনের ঝুঁকি হ্রাস করা গেলে দেশের কৃষি খাত তথা কৃষক সমৃদ্ধ হবেন। আর দেশের কৃষি খাত সমৃদ্ধ হলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

ধানের পাশাপাশি এই অঞ্চলে উৎপাদিত ফল (যেমন: আম, লিচু) ও শাকসবজি সংরক্ষণ ও পরিবহনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। কারণ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের খাদ্যাভাস পরিবর্তিত হয়। আয় বৃদ্ধি ফল ও শাকসবজির চাহিদা বৃদ্ধি ঘটায়। কৃষির বৈচিত্র্যকরণ ও কৃষিকে আরও লাভজনক করবার ক্ষেত্রে এই খাতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কিন্তু যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে এর সুবিধা থেকে কৃষক বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই, এই অঞ্চলে উৎপাদিত ফল ও শাকসবজির স্বাস্থ্যসম্মত

সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হলে এই খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব।

কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকাণ্ড এবং জীবনীশক্তি। উৎপাদনশীলতা, আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যশস্যসহ প্রায় সব কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত একটি দেশ। প্রাথমিক পণ্য হিসেবে এখন অনেক কৃষিজাত পণ্যই বাংলাদেশ বিদেশে রপ্তানি করছে। যেকোনো পণ্য প্রাথমিক পণ্য বা কাঁচামাল হিসেবে রপ্তানি করার চেয়ে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে শিল্পজাত পণ্য হিসেবে রপ্তানি করা সম্ভব হলে আয় অনেক বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন ঘটে অনেক বেশি। এর ফলে শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং কর্মসংস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে রংপুর বিভাগ একটি উৎকৃষ্ট অঞ্চল; কারণ এই অঞ্চলটি কৃষির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এখানে কৃষি শিল্পের প্রসার ঘটানো খুবই সহজ ও লাভজনক। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। পাশাপাশি এ অঞ্চলের চা শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করা সম্ভব।

শিল্পায়ন বা শিল্পখাতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করে দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি, ২০১৬' ঘোষণা করা হয়। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। উল্লেখ্য, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম। রংপুর বিভাগের বিশাল জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে সহজেই এই অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পরিসর আরও বিস্তৃত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে এই অঞ্চলে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) আরও অধিক জনগোষ্ঠীকে এর নৈপুণ্য বিকাশকেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যেমন রেডিও-টিভি মেরামত, হাউজওয়্যারিং অ্যান্ড মোটর ওয়েল্ডিং, চামড়াজাত পণ্য তৈরি, উন্নতমানের বাঁশজাত পণ্য তৈরি, টেইলরিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, পাটজাত দ্রব্য তৈরি, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ (মারকার পেনসিল তৈরি), শ্যালো মেশিন মেরামত, রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনার রিপেয়ারিং ইত্যাদি এবং নৈপুণ্য বিকাশকেন্দ্রবহির্ভূত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স যেমন- মৌমাছি পালন, শতরঞ্জি তৈরি, বেনারসী শাড়ী তৈরি, প্রাথমিক পর্যায়ের শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে এই অঞ্চলের জনগণকে কারিগরীভাবে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদেরকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

মানবসম্পদ

মানবসম্পদই বাংলাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ কারণ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের নিমিত্তে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৬৭.৬ শতাংশই কর্মক্ষম। বিপুল

কর্মক্ষম এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হবার ক্ষেত্রে মানব সম্পদই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং এই অবদানের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮)। এ প্রেক্ষাপটে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালালেও এক্ষেত্রেও রংপুর বিভাগের বিশাল জনগোষ্ঠী উপেক্ষিত রয়েছে যা এই বিভাগের ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার বেকারত্বের হার (৮.০%) দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ, এই বিভাগে বেকারত্বের হার বাংলাদেশের সামষ্টিক বেকারত্বের হারের (৪.২%) প্রায় দ্বিগুণ (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

তাই রংপুর বিভাগের অন্তর্ভূক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতসহ সামাজিক খাতসমূহে অধিক বিনিয়োগ করার পাশাপাশি এ অঞ্চলের এত বিশাল জনগোষ্ঠীকে যদি বিভিন্ন ধরনের কর্মমুখী শিক্ষা তথা কারিগরি প্রশিক্ষণের আওতায় এনে দেশে-বিদেশে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করা যায়, তাহলে এই মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়েই রংপুর বিভাগের আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করা সম্ভব।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি রংপুর বিভাগের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে অবস্থিত। এই কয়লা খনিতে মজুদের পরিমাণ ৩৯০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং এখানে বিটুমিনাস কয়লা পাওয়া যায়। এই খনি থেকে প্রাপ্ত কয়লা দিয়ে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন)। এই খনিতে অনেক মানুষ কর্মরত থাকলেও দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে তা কার্যকর ফলাফল আনয়ন করতে পারছে না। সে জন্য এ কয়লা খনিতে দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লোকবল নিয়োগ দিয়ে একদিকে যেমন এ অঞ্চলের মানুষের জন্য স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা সম্ভব, অন্যদিকে শিল্প-কলকারখানা গড়ে তুললে সেখানে এই খনির কয়লা দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করা সম্ভব। এর ফলে এখানকার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হওয়ার পাশাপাশি অঞ্চলটিও সামগ্রিকভাবে উন্নত হবে, যাকে সম্ভাবনা হিসেবে কাজে লাগানো যায়।

দিনাজপুর লোহার খনি

রংপুর বিভাগের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার হাকিমপুরে দেশের প্রথম লোহার খনির সন্ধান পেয়েছে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)। জিএসবি জানিয়েছে, খনিটিতে উন্নত মানের লোহার আকরিকের (ম্যাগনেটাইট) পাশাপাশি মূল্যবান কপার, নিকেল ও ক্রোমিয়ামের উপস্থিতিও রয়েছে যার পরিমাণ প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ মিলিয়ন টন। এছাড়াও এই খনির পাশে নতুন করে দীঘিপাড়া কয়লা খনির কাজ চলছে। এসব খনি থেকে পুরোদমে উত্তোলন শুরু হলে উত্তরাঞ্চলসহ সারা দেশের মানুষদের জীবনমান পাল্টে যাবে। কর্মসংস্থান হবে এখানকার মানুষদের। দেশেরও লাভও হবে (দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৮, ২০১৯)।

স্থলবন্দর

স্থলবন্দর হলো সীমান্তে অবস্থিত আন্তদেশীয় পণ্য ও যাত্রী যাতায়াত এবং বিনিময় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র। বর্তমানে রংপুর বিভাগে প্রস্তাবিত একটি স্থলবন্দরসহ মোট স্থলবন্দরের সংখ্যা ৫টি। যথা: বাংলাবান্ধা

স্থলবন্দর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।
হিলি স্থলবন্দর, হাকিমপুর, দিনাজপুর।
বিরল স্থলবন্দর, বিরল, দিনাজপুর।
বুড়িমারী স্থলবন্দর, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
সোনাহাট স্থলবন্দর, ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

উপরোক্ত স্থলবন্দরগুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো সহজ যাবে। উদাহরণে হিসেবে বলা যায়, দিনাজপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা হলে এখানকার উৎপাদিত পণ্য সহজে হিলি, বিরল ও বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে ভারত, নেপাল ও ভূটানে রপ্তানি করা সহজ হবে। যার ফলে এই অঞ্চলের মানুষ একদিকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন সাধিত হবে। তা ছাড়া, এসব স্থলবন্দর দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে গমনাগমন সহজ হবে।

বিমানবন্দর

ব্রিটিশ আমলে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শিবগঞ্জ এলাকায় ২৫০ একর জমির উপর নির্মিত বিমানবন্দরটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই বিমানবন্দরে বিমান চলাচলের সব ধরনের অবকাঠামো রয়েছে। এটি চালু করতে তেমন কোনো খরচ হবে না। এই বিমানবন্দর চালু হলে একদিকে যেমন অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে এই অঞ্চলের মানুষেরা চলাচলের নিমিত্তে আরও বিকল্প উপায় পাবে। পাশাপাশি নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আঞ্চলিক বিমানবন্দরে রুপান্তর করার নিমিত্তে সরকার কাজ করছে (প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০১৬)। এই বিমানবন্দরগুলোকে ব্যবহার করে দেশের অভ্যন্তরে এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে আমাদের দেশের জনগণ বিশেষ করে এই অঞ্চলের জনগণ যেকোনো প্রয়োজনে সহজে যাতায়াত করতে পারবে।

সমস্যাসমূহ

রংপুর বিভাগের উন্নয়নের সম্ভাবনাসমূহকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে যে যে বিষয়গুলো সমস্যা হিসেবে প্রতীয়মান হয় তা নিম্নরূপ:

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালনকারী উপাদান। রংপুর বিভাগের জেলাগুলি নানাবিধ কারণে এক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদ। সরকার এ সমস্ত পিছিয়ে পড়া এলাকা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করলে সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্রের মাত্রা হ্রাস ও অঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে দীর্ঘমেয়াদে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিভাগভিত্তিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান তুলনা করলেই সহজেই আঞ্চলিক বৈষম্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রংপুর বিভাগে বৈদেশিক কর্মসংস্থান (১,৪১,৪৭৫ জন) বাংলাদেশের সর্বশেষ বিভাগ ময়মনসিংহের

সারণি ১: বিভাগ ভিত্তিক বৈদেশিক কর্মসংস্থান (২০০৫-২০১৮)

বিভাগ	জেলা	বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংখ্যা	%	বিভাগ	জেলা	বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংখ্যা	%
	কুমিল্লা	৮,৭৩,৪৩৮	১০.৭৬		মাগুরা	৩৭,৫৭২	০.৪৬
	চট্টগ্রাম	৬,৮০,৬৬১	৮.৩৮		সাতক্ষীরা	৩৭,২৮১	০.৪৬
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪,৩৮,১২৬	৫.৪০	খুলনা	বাগেরহাট	৩৭,২৮৯	০.৪৬
	চাঁদপুর	৩,৩২,৯৩৬	৪.১০	(৫,৩৯,৩৪১	খুলনা	৩৬,০১৪	০.৪৪
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	৩,১৮,৩২১	৩.৯২	জন বা, ৬.৬৪)	নড়াইল	৩২,৪২০	০.৪০
(৩১,৭০,৬১১	ফেনী	২,১২,৫২৪	২.৬২		মোট	৫,৩৯,৩৪১	৬.৬৪
জন বা,	লক্ষীপুর	১,৯৯,৭৩২	২.৪৬		বগুড়া	১,০৮,২৬৩	১.৩৩
৩৯.০৪%)	কক্সবাজার	৯৮,৮২৬	১.২২		পাবনা	৯৪,০২৭	১.১৬
	খাগড়াছড়ি	৭,৮০৮	০.১০		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৬,৭৬৪	০.৯৫
	রাঙ্গামাটি	৪,৪৮১	০.০৬	রাজশাহী	নওগাঁ	৬৩,৩৫৪	০.৭৮
	বান্দরবন	৩,৭৫৮	০.০৫	(৪,৯৯,৮৫৫	সিরাজগঞ্জ	৫৮,০৯৮	০.৭২
	মোট	৩১,৭০,৬১১	৩৯.০৪	জন বা, ৬.১৬)	রাজশাহী	৩৯,৩২৪	০.৪৮
	টাঙ্গাইল	৪,০১,২৯২	৪.৯৪		নাটোর	৩৮,৬১৭	০.৪৮
	ঢাকা	৩,৬৯,২০৭	৪.৫৫		জয়পুরহাট	২১,৪০৮	০.২৬
	মুন্সীগঞ্জ	২,৩৭,৪০৬	২.৯২		মোট	৪,৯৯,৮৫৫	৬.১৬
	নরসিংদি	২,৩১,৯৩৭	২.৮৬		বরিশাল	১,১৪,৪১৫	১.৪১
	নারায়ণগঞ্জ	২,০৩,১০৪	২.৫০		ভোলা	৭৪,৬২১	০.৯২
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	২,০২,৬৯৩	২.৫০	বরিশাল	পিরোজপুর	৪৮,২৬৬	০.৫৯
(২৫,১৬,৭৯৫	গাজীপুর	১,৮৬,৯৭৫	২.৩০	(৩,৩৬,২২৭	বরগুনা	৩৫,৩০৫	০.৪৩
জন বা,	ফরিদপুর	১,৭৬,৭৩০	২.১৮	জন বা, ৪.১৪)	পটুয়াখালী	৩৩,৬৩৩	০.৪১
৩০.৯৯%)	মানিকগঞ্জ	১,৭৩,০২৩	২.১৩		ঝালকাঠি	২৯,৯৮৭	০.৩৭
	মাদারীপুর	১,১২,৯৫৪	১.৩৯		মোট	৩,৩৬,২২৭	৪.১৪
	শরীয়তপুর	১,০৮,৩৪০	১.৩৩		ময়মনসিংহ	১,৭৮,৪৭৩	২.২০
	রাজবাড়ী	৬৩,৬৭১	০.৭৮	ময়মনসিংহ	জামালপুর	৭১,৬১৮	০.৮৮
	গোপালগঞ্জ	৪৯,৪৬৩	০.৬১	(৩,০৫,২৮৮	নেত্রকোণা	৩৭,৯৩৭	০.৪৭
	মোট	২৫,১৬,৭৯৫	৩০.৯৯	জন বা, ৩.৭৬)	শেরপুর	১৭,২৬০	০.২১
	সিলেট	১,৯৬,২৯৬	২.৪২		মোট	৩,০৫,২৮৮	৩.৭৬
সিলেট	মৌলভীবাজার	১,৬০,৫১৪	১.৯৮		গাইবান্ধা	৩৫,৫৭১	০.৪৪
(৬,১১,৩১৪	হবিগঞ্জ	১,৪৫,৩৮৪	১.৭৯		রংপুর	২৮,২৩৯	০.৩৫
জন বা,	সুনামগঞ্জ	১,০৯,১২০	১.৩৪		দিনাজপুর	২২,০৫১	০.২৭
৭.৫৩)	মোট	৬,১১,৩১৪	৭.৫৩	রংপুর	কুড়িগ্রাম	১৮,৬৭৭	০.২৩
	যশোর	৯৬,৭২৭	১.১৯	(১,৪১,৪৭৫	নীলফামারী	১৩,৯৫৫	০.১৭
খুলনা	কুষ্টিয়া	৮৬,৩৫৭	১.০৬	জন বা, ১.৭৪)	ঠাকুরগাঁও	১১,৪৩৮	০.১৪
(৫,৩৯,৩৪১	ঝিনাইদহ	৭৬,৭৯৭	০.৯৫		লালমনিরহাট	৬,৬১৩	০.০৮
জন বা,	মেহেরপুর	৫৮,৬৪২	০.৭২		পঞ্চগড়	৪,৯৩১	০.০৬
৬.৬৪)	চুয়াডাঙ্গা	৪০,২৪২	০.৫০		মোট	১,৪১,৪৭৫	১.৭৪
		সর্বমোট = ৮১,২০,৯০৬ জন					

উৎস: প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-২০১৯।

(৩,০৪৫,২৮৮ জন) মাত্র ৪৬.৩৪ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, শুধু কুমিল্লা জেলায় (৮,৭৩,৪৩৮ জন) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের হার (১০.৭৬%) রংপুর বিভাগের (১,৪১,৪৭৫ জন বা, ১.৭৪%) চেয়ে প্রায় ৬.১৭ গুণ বেশি।

বেকারত্ব

বাংলাদেশের অন্য যেকোনো বিভাগের চেয়ে রংপুর বিভাগে বেকারত্বের হার সর্বাধিক যা এই বিভাগের উন্নয়নের পথে এক বিশাল অন্তরায়। তাই রংপুর বিভাগকে উন্নত করতে হলে এই বিভাগের বেকাত্বের হার প্রশমনে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। অন্যথায়, এই ভগ্নদশা থেকে এই বিভাগের উত্তরণ অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার।

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, রংপুর বিভাগে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার বেকারত্বের হার (৮.০%) বাংলাদেশের সামষ্টিক বেকারত্বের হারের (৪.২%) প্রায় দ্বিগুণ।

সারণি ২: ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার বিভাগভিত্তিক বেকারত্বের হার

বিভাগ	গ্রাম			শহর			সর্বমোট		
	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
রংপুর	৪.৪	১৪.৮	৭.৭	৫.১	২০.৫	৯.৩	৪.৫	১৫.৬	৮.০
চট্টগ্রাম	৩.১	৭.৫	৪.৭	২.৮	৭.৭	৪.২	৩.০	৭.৫	৪.৫
বরিশাল	৩.৪	৫.১	৩.৯	৫.২	১১.৮	৬.৮	৩.৮	৬.১	৪.৪
খুলনা	২.৭	৫.৪	৩.৭	২.৫	৮.৮	৪.৩	২.৭	৬.০	৩.৮
ঢাকা	২.৪	৪.৭	৩.০	৩.১	৫.৬	৩.৮	২.৭	৫.১	৩.৩
সিলেট	২.৭	৪.২	৩.০	২.৫	৬.২	৩.১	২.৬	৪.৪	৩.১
রাজশাহী	২.৪	৩.১	২.৭	২.৮	৮.৪	৪.৫	২.৫	৩.৯	৩.০
সর্বমোট	২.৯	৬.৫	৪.১	৩.২	৭.৭	৪.৪	৩.০	৬.৮	৪.২

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ত্রৈমাসিক শ্রম শক্তি জরিপ ২০১৫-২০১৬, বিবিএস, ঢাকা, ২০১৭।

অবকাঠামোগত দুর্বলতা

অবকাঠামোগত দিক থেকেও রংপুর বিভাগ অনেক পিছিয়ে রয়েছে যার অন্যতম প্রধান কারণ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্য যা ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে এডিপি'র বরাদ্দের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস (বিআইপি)-এর 'জাতীয় বাজেটে আঞ্চলিক উন্নয়ন ভাবনা: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অঞ্চলভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটিতে প্রতীয়মান হয়েছে। বিআইপির গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী এডিপি'র বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্রটি নিম্নোক্ত সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

উপরোক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, উল্লিখিত সময়ে রংপুর বিভাগে এডিপি'র বরাদ্দ মাত্র ৩.১৩ শতাংশ যা বাংলাদেশের সর্বশেষ বিভাগ ময়মনসিংহের (৩.৫৩%) প্রাপ্ত বরাদ্দের চেয়েও কম। প্রতিবেদনটিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বৈষম্য শুধু বিভাগগুলোর মধ্যেই নয়, একই সঙ্গে তা একটি বিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলোর মধ্যেও বিদ্যমান। বাংলাদেশের জেলাগুলোয় বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অতি উচ্চ বৈষম্য রয়েছে। দেশের মধ্যাঞ্চল তুলনামূলকভাবে বরাদ্দের বেশির ভাগ অংশ পেয়ে থাকে। এডিপিতে সবচেয়ে কম বরাদ্দ পাওয়া জেলাগুলো হচ্ছে নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর ও বগুড়া।

সারণি ৩: ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বিভাগভিত্তিক বরাদ্দ

বিভাগ	এডিপিতে বরাদ্দের হার
ঢাকা	৩৮.৫৪
চট্টগ্রাম	২৭.৭৫
রাজশাহী	১০.১২
খুলনা	৮.২০
সিলেট	৪.৫৬
বরিশাল	৪.১৮
ময়মনসিংহ	৩.৫৩
রংপুর	৩.১৩

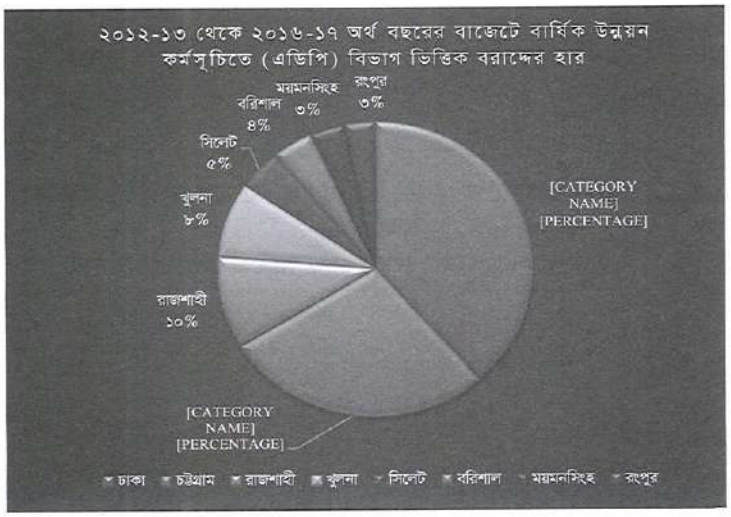

উৎস: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৯ মে ২০১৯

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপে বৈষম্য

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্বের যেসব দেশ সবচেয়ে অরক্ষিত অবস্থায় আছে, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশের লাখ লাখ নাগরিক নানা সময়ে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, দাবদাহ ও খরার মতো মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গাংগেয় ব-দ্বীপ অনেকাংশে ডুবে যাবে।

রংপুর বিভাগ কৃষিনির্ভর হওয়ায় খরা এই অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। তবে দুঃখের বিষয় হলো খরা মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপেও বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। বৈষম্য উন্নয়নের অনুসঙ্গী তবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা সবসময় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা সম্ভব। বৈষম্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা সম্ভব না হলে বা এর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করলে দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হবে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্যকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় যা সরকারের বিভিন্ন প্রকাশনায় স্বীকৃত, এমনকি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমস্যার সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি ও তা সমাধানের কর্মকৌশল প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। এই বৈষম্য বহুমাত্রিক ও বিবিধ কারণে তা সৃষ্ট।

আঞ্চলিক বৈষম্যের অন্যতম প্রধান কারণ সরকারের জ্বালানি নীতি ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ। বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি তথা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান সমস্যা খরা মোকাবিলায় সরকারের অবহেলার চিত্র সারণি- ৪ এ ফুটে ওঠে।

সারণি ৪: বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কর্মসূচি

Policy & Strategic Documents/Action plan	Projects/Strategies/ Objectives/ Priority Activities (total)	Related with droughts	Remarks
NAPA 2005	15(Priority Areas)	1	To promote research on drought resilient crops
National Food Policy 2008	26 (Area of Intervention)	0	Nothing on drought
BCCSAP 2009	44 (Programs)	1	R & D on the climate resilient cropping system and drought management option for farmers
Environment & Forest Ministry (MOEF)	25 (Projects for the period of 2009-14)	1	Related with forestation in 'Barind Tract'.
Sixth Five Year Plan (SFYP) 2011-15	35 (Proposed Program)	2	Related to research on climate resilient cultivars and adaptation to climate change, even no specific target was set and no concern on irrigation
National Agriculture Policy (NAP) 2013	9 (objectives)	0	Nothing to fight against drought
Ministry of Agriculture	62 (Projects of ADB on 2013-14)	3	Related with irrigation under BMDA routine projects. Nothing is there emphasizing the drought.
Prospective Plan 2010-2021	44	1	Only acknowledged the need of drought resilience seeds and efficient irrigation but no specific action.
Bangladesh Climate Change Trust Fund	207 (Projects for 2014)	4	Research on drought resilient crops, excavation and re-excavation of water-bodies & Forestation. Only 0.9 percent of total expenditure.

দারিদ্র্য

দারিদ্র্য হার হ্রাস রাষ্ট্র ও সমাজের আর্থসামাজিক অগ্রগতির অন্যতম নির্দেশক। সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং নানাবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্রের হার ছিল ৪০ শতাংশ, মাত্র এক দশকের ব্যবধানে ২০১৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে ২৪.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও এখনো মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। জনসংখ্যার বিরাট এই অংশকে দারিদ্র্যভুক্ত রেখে কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। তাই, এখনো দেশের সকল ধরনের নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলপত্রে দারিদ্র্য বিমোচনকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। 'খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১৬' অনুযায়ী উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসেবে দেশের ৩৬টি জেলা জাতীয় দারিদ্র্যসীমার উপরে অবস্থান করছে। পক্ষান্তরে,

নিম্ন দারিদ্র্যরেখার হিসাব অনুসারে ৩১টি জেলা জাতীয় দারিদ্র্যসীমার উপরে অবস্থান করছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮)।

দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে বৈশ্বিক মানক উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ বেশ অগ্রগতি অর্জন করলেও বাংলাদেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসের হার ভিন্ন। এক্ষেত্রে রংপুর বিভাগ অন্যান্য বিভাগ থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতিতে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের দারিদ্র্য হার নিম্নোক্ত সারণিতে তুলে ধরা হলো:

সারণি ৫: বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার

বিভাগ	উচ্চ দারিদ্র্যরেখা অনুযায়ী			নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
রংপুর	৪৭.২	৪৮.২	৪১.৫	৩০.৫	৩১.৩	২৬.৩
ময়মনসিংহ	৩২.৮	৩২.৯	৩২.০	১৭.৬	১৮.৩	১৩.৮
রাজশাহী	২৮.৯	৩০.৬	২২.৫	১৪.২	১৫.২	১০.৭
খুলনা	২৭.৫	২৭.৩	২৮.৩	১২.৪	১৩.১	১০.০
বরিশাল	২৬.৫	২৫.৭	৩০.৪	১৪.৫	১৪.৯	১২.২
চট্টগ্রাম	১৮.৪	১৯.৪	১৫.৯	৮.৭	৯.৬	৬.৫
সিলেট	১৬.২	১৫.৬	১৯.৫	১১.৫	১১.৮	৯.৫
ঢাকা	১৬.০	১৯.২	১২.৫	৭.২	১০.৭	৩.৩

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬

উপরোক্ত সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী রংপুর বিভাগে (৪১.৫%) দারিদ্রের হার নিকটবর্তী ময়মনসিংহ বিভাগ (৩২.৮%) থেকেও প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি যার ফলে এই অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি, অন্যথায় এই বিশাল জনসংখ্যাকে দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বের না করে এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

বাজেট বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্য

অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যেখানে কোনো একটি দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট জাতীয় আয় তথা কল্যাণের সাম্যভিত্তিক অংশীদার হতে পারে। উন্নয়ন অংশীদারীত্বের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া এবং উন্নয়নের ফল প্রপ্তির ক্ষেত্রে দুই ধরনের নিয়ামক ভূমিকা পালন করে, তা যথাক্রমে:

ক) প্রাকৃতিক ও ভৌত বৈশিষ্টাবলী, যেমন জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য, অনুন্নত অবকাঠামো, সম্পদের অপ্রতুলতা ইত্যাদি এবং

খ) সরকারের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই উন্নয়ন অংশীদারীত্বের প্রশ্নে উত্তরাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠী এই উভয় কারনেই উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার। উত্তরাঞ্চল বলতে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের মোট ১৬টি জেলাকে[১] বোঝানো হয়েছে। এই বৈষম্যের উপস্থিতি রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে প্রমাণিত। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক

১. বগুড়া, জয়পুরহাট, নাটোর, নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ও ঠাকুরগাঁ।

সারণি ৬: ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কয়েকটি জেলায় প্রদত্ত বরাদ্দের পরিমাণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

জেলা	সর্বমোট ব্যয়	উন্নয়ন ব্যয়
চট্টগ্রাম	৫৬৮২,৭৪,৭৯	২৫৭৯,৭৯,৪২
খুলনা	৩২৯২,৯৪,৬০	১৯৭১,৬২,২৮
টাঙ্গাইল	২২৩৪,৯৪,২৬	৯০৫,৭৩,৪৬
সিলেট	২১৭৪,৭৫,৮১	৮৭২,৯১,৭৬
রাজশাহী	২১৪৯,৭৮,৫৮	৫৯৪,৯৭,০৫
বরিশাল	২১০৬,৫১,০৫	৭৭৮,৭৮,০০
রংপুর	২০০৮,৪৩,৭৪	৭২৫,১১,৫৬

উৎস: বাংলাদেশের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট

বৈষম্য যত বৃদ্ধি পাবে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা তত বৃদ্ধি পাবে। বাজেটে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বরাদ্দ প্রদান প্রয়োজন। বাজেটে বরাদ্দের ক্ষেত্রে যে আঞ্চলিক বৈষম্য বিদ্যমান তা বাংলাদেশের কয়েকটি জেলার বাজেটের তুলনামূলক চিত্র থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

উপরোক্ত সারণিতে উল্লেখিত জেলাগুলোর মধ্যে রংপুর জেলায় বাজেট বরাদ্দ সর্বনিম্ন যা আঞ্চলিক বৈষম্য হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। তাই, এই অঞ্চলের উন্নয়নে জাতীয় বাজেটে রংপুর বিভাগের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অতীব জরুরি।

জ্বালানি ও শিল্পকলকারখানার অভাব

দেশের সব অঞ্চলের সুষম উন্নয়নে সকল অঞ্চলে জ্বালানির সুষম বণ্টনের বিকল্প নেই। কিন্তু এই দিক দিয়েও রংপুর বিভাগ অবহেলিত কারণ এই অঞ্চলে সরাসরি জ্বালানি তথা গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন নেই (দৈনিক সমকাল, মার্চ ১০, ২০১৮) যার ফলে এই অঞ্চলে শিল্প কলকারখানা গড়ে ওঠে নি। এজন্য জ্বালানি সমস্যার কারণে এই অঞ্চল পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাসের সরবরাহ আছে এরকম অঞ্চল থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, যা এই অঞ্চলের অগ্রগতিতে বাধাস্বরূপ। সিলিন্ডারের মাধ্যমে যদিও এই অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু মূল্য, প্রায়োগিক দিক ও কার্যকারিতা বিবেচনায় এই সিলিন্ডারের মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্যাস আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিবেচনায় খুব বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। এমনকি এই অঞ্চলের পরিবহন খাতও পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাসের সরবরাহ আছে এ রকম অঞ্চল থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

করণীয়

১. মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে হবে। এই অঞ্চলের জেলাগুলিতে কর্মমূখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করলে আয়বৈষম্য অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কমিয়ে আনা সম্ভব। যেখানে সরকার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিহীনভাবে কোটা ব্যবস্থা চালু রেখেছে, সেখানে বাস্তবতার

নীরিখে এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আয়বৈষম্য হ্রাসে উল্লিখিত ব্যবস্থা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

২. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আবাদী জমি হ্রাসের প্রেক্ষাপটে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সামনের দিনগুলিতে কৃষি গুরুত্বের তালিকার শীর্ষে অবস্থান করবে। কৃষির ঝুঁকি হ্রাস ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এ অঞ্চলে আয় সৃষ্টির মাধ্যমে আয়বৈষম্য ও দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা পালন করবে। কৃষির অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত বিনিয়োগ এক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করবে, বিশেষ করে সেচের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ। তাছাড়া বিপণন অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করলে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পাবে।

৩. সরাসরি জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে শিল্প কলকারখানা গড়ে তুলে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। কারণ এর ফলে এই বিভাগের মানুষের জীবন মানের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ে শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠলে একদিকে যেমন পুরুষের সাথে নারীরাও গৃহস্থালির কাজকর্ম সম্পাদন করার পাশাপাশি স্থানীয় কলকারখানায় কাজ করে অর্থ উপার্জন করে সংসারে আর্থিকভাবে অবদান রাখতে পারবে, অন্যদিকে কলকারখানাগুলো তুলনামূলকভাবে কম খরচে পণ্য উৎপাদন করতে পারবে। এর ফলে এই অঞ্চলের মানুষের বিশেষ করে নারীদের একদিকে যেমন কাজের জন্য ঢাকা বা অন্য কোনো শহরে স্থানান্তরিত হতে হবে না, অন্যদিকে নারীরা সরাসরি অর্থ উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত হলে তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা ও সামাজিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

৪. সরকারি খরচের বৈষম্য দূর করতে হবে। গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত গ্যাস আঞ্চলিক আয়বৈষম্য সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া এই অঞ্চলে গরুর গোবর নির্ভর গৃহস্থালী জ্বালানিব্যবস্থা কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। গৃহস্থালী কাজে ন্যায্য মূল্যে সিলিন্ডারের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করে আয়বৈষম্য হ্রাস ও কৃষি জমির উর্বরতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে দীর্ঘ মেয়াদে আয়বৈষম্য হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৫. শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো বৃদ্ধি ও বিদ্যমান অবকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করবার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন অংশীদারীত্বের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে বৈকালিক বা সান্ধ্যকালীন পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকশিত হয়। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশে বিশেষ প্রনোদনা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করতে হবে। শিল্পে ও পরিবহনে জ্বালানি সমস্যা নিরসনে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৭. কৃষিপণ্যের বিপণনব্যবস্থার দুর্বলতা বাংলাদেশে কৃষি খাতের অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্থ করছে। বিপনন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় কৃষির বৈচিত্র্যকরণ জরুরি। এ ছাড়াও নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে:

ক) বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
খ) সেচের ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
গ) কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

উপসংহার

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্নে পূর্ব বাংলার জনগণ আশা পোষণ করেছিল পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বাঙালির আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনালগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক মহল পূর্ব বাংলাকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে ভাবতে থাকে এবং ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ শুরু করে। পূর্ব বাংলার জনগণ রাজস্ব আয়-ব্যয়, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ, উন্নয়ন প্রকল্প, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের বণ্টন এবং আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শোষণের শিকার হতে থাকে। এরূপ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। যার সফল পরিণতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশেও এই ধরনের বৈষম্য দৃশ্যমান রয়েছে। জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দের ক্ষেত্রে দেশের উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে রংপুর বিভাগ আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার হওয়ার পাশাপাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বেকারত্ব হ্রাস, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানব সম্পদ খাতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি খাতে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে যা আলোচ্য প্রবন্ধটিতে প্রতীয়মান হয়েছে। উপরোক্ত বৈষম্যগুলো নিরসন করা না গেলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ–যেখানে সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচারের নিশ্চয়তা থাকবে - প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই আলোচ্য প্রবন্ধটি এই ধরনের বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দাবি রাখে।

তা ছাড়া, দেশের সকল জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। রংপুর বিভাগ কৃষিনির্ভর হওয়ায় এই অঞ্চলের কৃষি খাতে বিনিয়োগ করার পাশাপাশি এখানকার বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতসহ সামাজিক খাতসমূহে বিনিয়োগের সাথে এই অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা গেলে তা যেমন এই অঞ্চল তথা দেশের জন্য লাভজনক তেমনি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের উচিত জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের প্রতি বৈষম্য না করা এবং এই অঞ্চলের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া, কারণ কোনো একটি অঞ্চলকে বাদ দিয়ে কোনো দেশেরই সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অর্থবছরের জাতীয় বাজেট।

৩. খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ঢাকা।

৪. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ঢাকা।

৫. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৬. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৭. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৮. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস (বিআইপি) এর 'জাতীয় বাজেটে আঞ্চলিক উন্নয়ন ভাবনা: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অঞ্চলভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন।

৯. ত্রৈমাসিক শ্রম শক্তি জরিপ ২০১৫-২০১৬, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ঢাকা।

১০. দৈনিক কালের কণ্ঠ, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বারিধারা, ঢাকা।

১১. দৈনিক সমকাল, তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

১২. দৈনিক প্রথম আলো, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

১৩. বাংলা ট্রিবিউন (অনলাইন সংবাদমাধ্যম), পান্থপথ, শুক্রাবাদ, ঢাকা।

১৪. দৈনিক ইনকিলাব, আর কে মিশন রোড, ঢাকা।